স্বাগতম

বিষয় কোডঃ

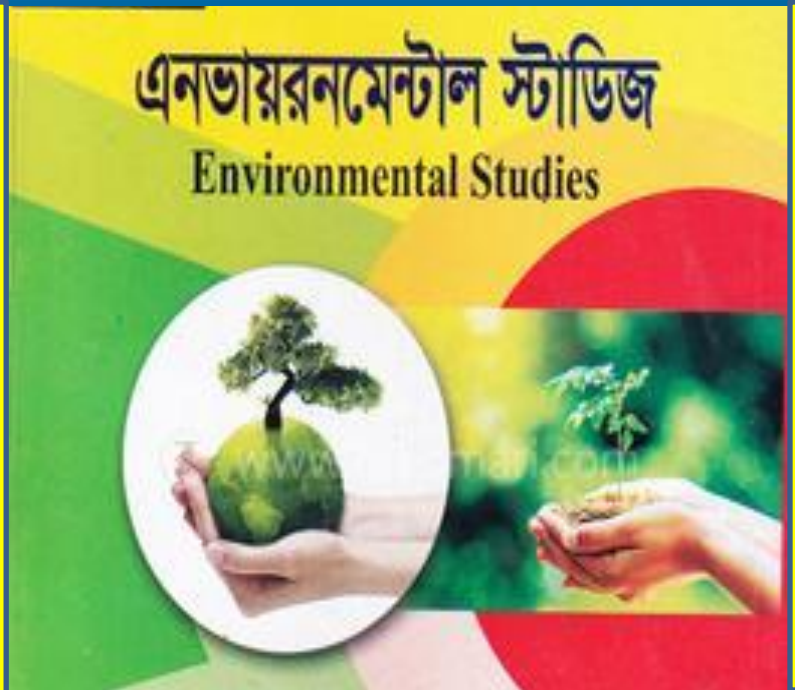

২৯০৪১

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

সিভিল টেকনোলজি

৬ষ্ঠ পর্ব

শিক্ষকের নাম: ফারজানা মিমি
খন্ডকালীন শিক্ষক (সিভিল)

অধ্যায় -১

পরিবেশগত শিক্ষার ভুমিকা

পরিবেশগত শিক্ষা

১.২ পরিবেশের উপাদানসমুহঃ

প্রতিটি জীবের একটি স্বতন্ত্র পরিপার্শ্ব বা মাধ্যম রয়েছে, যার সঙ্গে জীব সম্পূর্ণভাবে অভিযোজিত এবং অবিরাম মিথষ্ক্রিয়ায় লিপ্ত। এ পরিপার্শ্বই হলো জীবের 'প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural environment)'। প্রাকৃতিক পরিবেশের উদাহরণ হিসেবে পৃথিবীর ভূখণ্ডে স্থলভাগের, জলের মরুভূমির এবং হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ উল্লেখ করা যেতে পারে (চিত্র ১.২)। প্রতিটি প্রাকৃতিক পরিবেশ অন্যের থেকে পৃথক; কারণ প্রতি পরিবেশের মৃত্তিকার গঠন, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং জীবগোষ্ঠীর প্রভাব স্বতন্ত্র। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) সজীব উপাদান বা বায়োটিক কম্পোনেন্ট (Living or biotic component) এবং

(খ) অজীব (বা জড়) উপাদান বা অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট (Non-living or abiotic component) | (ক) সজীব উপাদান (Living or biotic component) : সকল প্রকার জীব বা জীবন্ত উপাদানসমূহ সজীব উপাদানে অন্তর্ভুক্ত। নিম্নলিখিত জীবগোষ্ঠী সজীব উপাদানের অন্তর্ভুক্ত-
(i) উদ্ভিদ (Plant) : উদ্ভিদজগতের সকল শ্রেণির/গোত্রের উদ্ভিদ এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- তৃণ, লতাগুল্ম, বৃক্ষ ইত্যাদি। (ii) প্রাণী (Animal) : প্রাণিজগতের সকল পর্বের প্রাণী এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- হাইড্রা, কেঁচো, কৃমি, শামুক, স্টার ফি

টিকটিকি, পাখি, গৃহপালিত পশু, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি।

(iii) অণুজীব (Microbs) : অতিক্ষুদ্রাকৃতি আণুবীক্ষণিক জীব এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবা ঈস্ট ইত্যাদি।

(iv) মানুষ (Human) : সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- মানুষ: (Homosapiens- হোমোস্যাপিয়েন্স)।

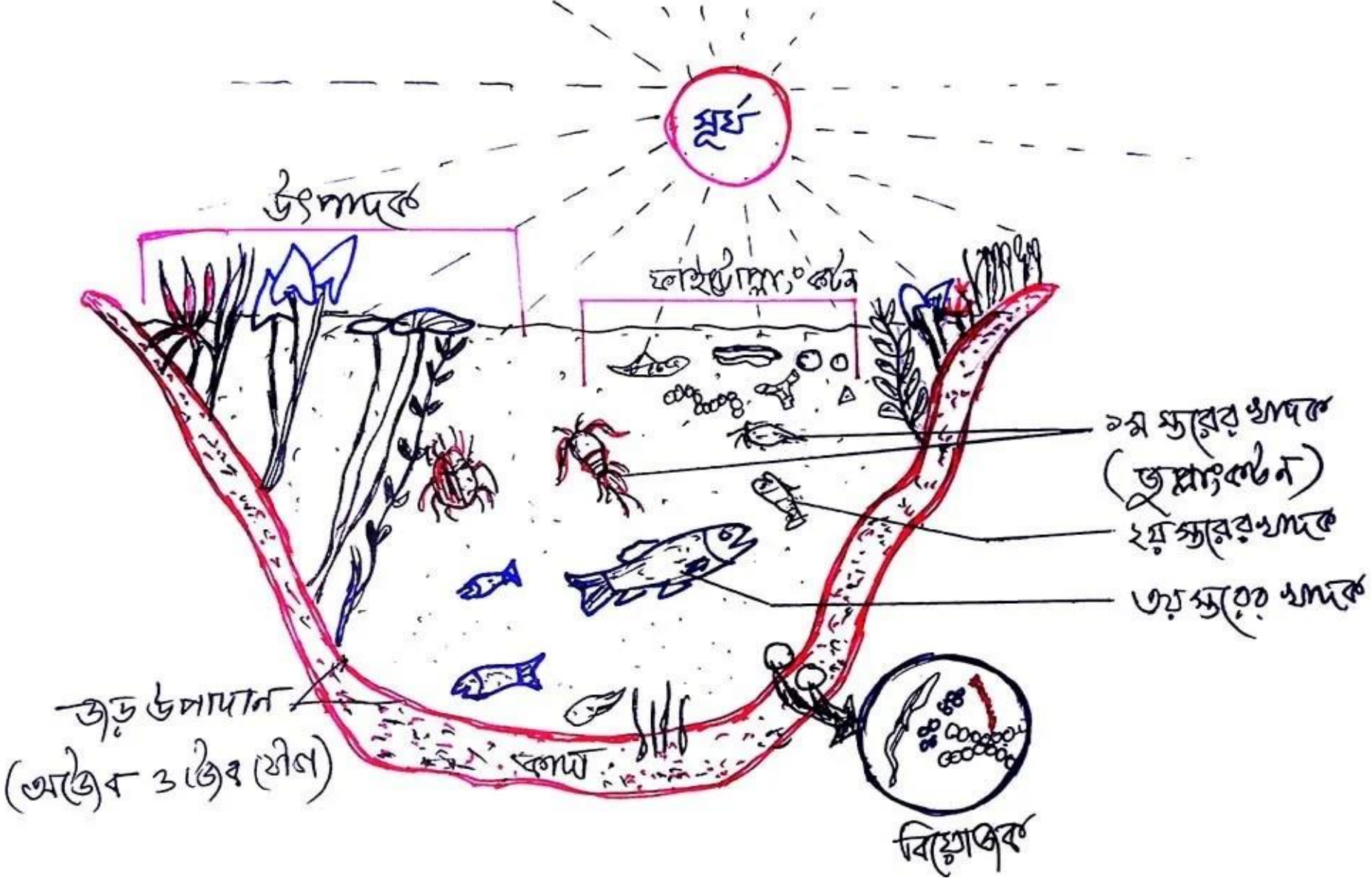

চিত্র: কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশের সজীব ও অজীব উপাদানসমূহ।

(খ) অজীব (বা জড়) উপাদান (Non-living or abiotic component) : সকল উপাদান জীবন্ত নয়, কিন্তু জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তা অজীব (বা জড়) উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ অজীব উপাদান বা অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টের অন্তর্ভুক্ত-

(i) ভৌত উপাদান (Physical components)

(ii) রাসায়নিক উপাদান (Chemical components)

(iii) জলবায়ুসংক্রান্ত উপাদান (Climatic components) ।

(i) ভৌত উপাদান (Physical components): কোনো স্থানের ভৌত অবস্থা যেমন- মাটি, পানি, বায়ু, হিউমাস ও খনিজ লবণ, ভূ- প্রাকৃতিক অবস্থা এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

(ii) রাসায়নিক উপাদান (Chemical components): অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অম্লত্ব, ক্ষারকত্ব, নাইট্রোজেন, আয়রন,

ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, বিভিন্ন প্রকার মূলকনাইট্রেট, কার্বনেট, ফসফেট ইত্যাদি।

(iii) জলবায়ুসংক্রান্ত উপাদান (Climatic components) : কোনো নির্দিষ্ট স্থানের তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, সূর্যালোকের পরিমাণ, জলস্রোত ইত্যাদি এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যায় -২

বাস্তবিদ্যা ও বাস্তসংস্থান

চিত্র: বাস্তবিদ্যা

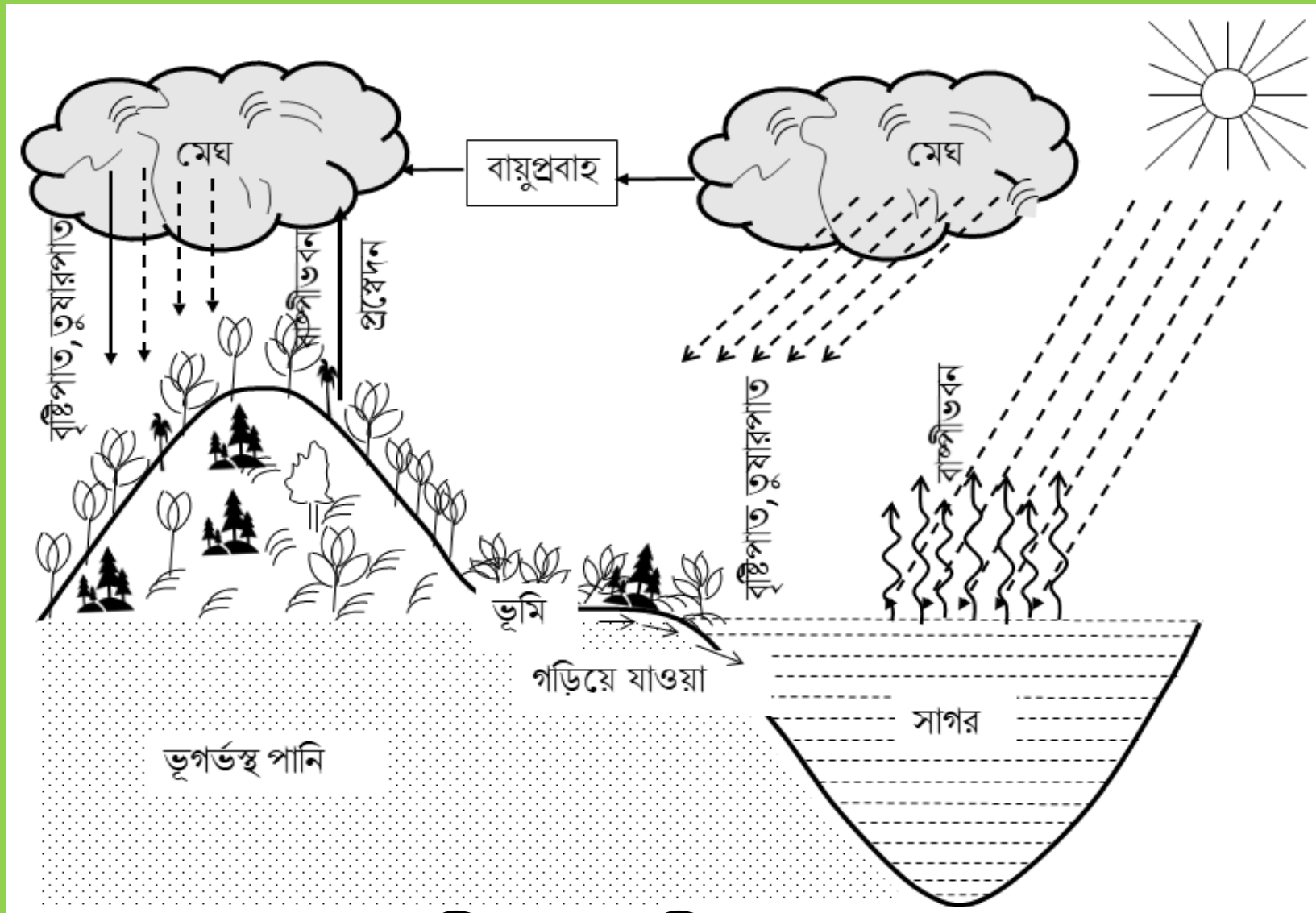
মেঘ
বায়ুপ্রবাহ
মেঘ
বৃষ্টিপাত, তুষারপাত
বাষ্পীভবন
প্রস্বেদন
বৃষ্টিপাত, তুষারপাত
বাষ্পীভবন
ভূমি
গড়িয়ে যাওয়া
সাগর
ভূগর্ভস্থ পানি

চিত্র: পানিচক্র

চিত্র ২.২ অনুযায়ী সমুদ্রের পানি সৌর বিকিরণের তাপশক্তি দ্বারা বাষ্পায়িত হয়। এই বাষ্পায়িত জলীয় কণা উপরে উঠে মেঘ রূপ ধারণ ২৭ করে। যখন এই মেঘরাশির কিছু অংশ ঘনীভূত হয় তখন তা বৃষ্টিরূপেই সমুদ্রের উপর পুনারায় ফিরে আসে। অপরদিকে অবশিষ্ট মেঘরাশি বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে স্থলভাগের দিকে চলে আসে এবং ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি, তুষার, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি এমনকি শিশিররূপে অধঃক্ষিপ্ত হয়। এমনকি এই অধঃক্ষেপের সময়ও অধঃক্ষেপের কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। অবশিষ্টাংশ গাছপালা, বিল্ডিং-স্ট্রাকচার এবং অন্যান্য অনুরূপ পৃষ্ঠতল কর্তৃক শোষিত হয়, যা পুনরায় বাষ্পরূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় অথবা ভূনিম্নস্থ তলে কিছু স্থানান্তরিত হয়। পানির যে অংশ ভূপৃষ্ঠ থেকে মাটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ভূনিম্নস্থ তলে স্থানান্তরিত হয়ে মৃত্তিকার আর্দ্রতা এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি
করে, তাকে অনুস্রবণ (Infiltration) ও পরিস্রাবণ (Percolation) বলে। এর কিছু অংশ' গাছপালা ভূনিম্নস্থ মাটি হতে শোষণ করে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি প্রস্বেদন (Transpiration) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে।

অনুস্রবণ এবং বাষ্পীভবনের পর পানি প্রাকৃতিক ঢাল অনুসারে নিচের দিকে ধাবিত হয় এবং পানি প্রাকৃতিকভাবে ঝরনা, নদীনালা, জলাশয় হয়ে সাগরে প্রবাহিত হয়। অধঃক্ষেপের কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে মূল স্রোতস্বিনীতে পৌছে, যাকে রান-অফ বা
পৃষ্ঠস্থ রান-অফ বলে। উপরোল্লিখিত সকল ধারাবাহিক ঘটনাবলি একটি জটিল চক্রের এক একটি ধাপের সরল চিত্রের সমন্বয়, যা পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই অনবরত ঘটে চলেছে। তাই দেখা যায়, পানিচক্র একটি জটিল চক্র, যা অনন্ত পথ অতিক্রম করেছে বিভিন্ন সময় স্কেলে। এই চক্রেনা শুরু বা শেষ নেই।
পানিচক্রের কিছু বৈশিষ্ট্যবলি নিম্নরূপ- (1) পানিচক্র একটি বিরতিহীন চক্র।
(ii) পানিচক্রের প্রধান চালিকাশক্তি হলো সৌরশক্তি (Solar energy)। (iii) এই চক্রটি একটি গন্তব্যহীন (Endless circulation) চক্র। কারণ এর শুরু, শেষ এমনকি বিরতি নেই। এটি স্থির বা ধ্রুবও নয়। শুরু বিন্দু হিসাবে ধরা হয় চক্রের ব্যাখ্যার সুবিধার্থে।
(iv) সমুদ্র থেকে বাষ্পীভবন হয় বলে এটাকে (v) চক্রে বিভিন্ন পথে পানির গুণগত মান পরিবর্তিত হয়। পানিচক্রের ধাপঃ
পানিচক্র ৪টি প্রধান ধাপে সংঘটিত হয়। ধাপগুলো যথাক্রমে-
ধাপ-১: বাষ্পীভবন, প্রস্বেদন ও বাষ্পীয়-প্রস্বেদন: পানি সমুদ্রপৃষ্ঠ, ভূপৃষ্ঠ বিভিন্ন জলাশয় এমনকি ভিজা মৃত্তিকাপৃষ্ঠ থেকে বাষ্পীভবন এবং গাছপালার পাতা ও গাছের সবুজ অংশ থেকে বাষ্পীয়-প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় জলীয় বাষ্প কণাকারে বায়ুমণ্ডলে আসে। এই প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি মুখ্য চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। এর পাশাপাশি বায়ুপ্রবাহ ও বাতাসের অর্দ্রেতা এই প্রক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে। ধাপ-২ঃ ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপণ: পানি জলীয় বাষ্প কণারূপে সাদা মেঘ আকারে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়। পরবর্তীতে বায়ুপ্রবাহের
মাধ্যমে তাড়িত হয়ে স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসে এবং তাপমাত্রা দ্বারা ও পর্বতের হিমবাহ গাত্রে বাধা পেয়ে ঘনীভূত হয় এবং ক্ষুদ্র জলকণা বৃহৎ জলকণায় রূপান্তরিত হয়।
ঘনীভূত বৃহৎ জলকণা পর্বতের অনুবাত ঢালে বৃষ্টি বা তুষার বা শিলারূপে পতিত হয়, এমনকি রাতের বেলায় শিশিররূপে পতিত হয়। মোটকথা বায়ুমণ্ডল থেকে যে-কোনোরূপে পানির ভূপৃষ্ঠে আগমনকে অধঃক্ষেপণ বলা হয়।
ধাপ-৩: অনুস্রবণ ও ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ: বায়ুমণ্ডল থেকে ভূপৃষ্ঠে অধঃক্ষিপ্ত পানির সর্বপ্রথম যে অংশ মাটির উপরিস্তরের মৃত্তিকাকে সম্পৃক্ত করতে
ব্যয় হয়, তাকে অনুস্রবণ বলে। উপরিস্তরের মাটি পানি দ্বারা সম্পৃক্ত হওয়ার পর পানির যে অংশ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে ভূপৃষ্ঠের নিম্নঢাল অনুসারে প্রবাহিত হয়, তাকে সারফেস রান-অফ বা ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ বলে।
ধাপ-৪: ভূগর্ভস্থ প্রবাহঃ অনুস্রবণ ও পৃষ্ঠস্থ রান-অফের পর পানির অবশিষ্ট যে অংশ মাটির করারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে নিম্নদিকে ধাবিত হয়ে
ভূগর্ভস্থ স্তরে পৌছায় এবং পরিশেষে ভূগর্ভস্থ স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পৌছায়, তাকে সাব-সারফেস ফ্লো বলে।

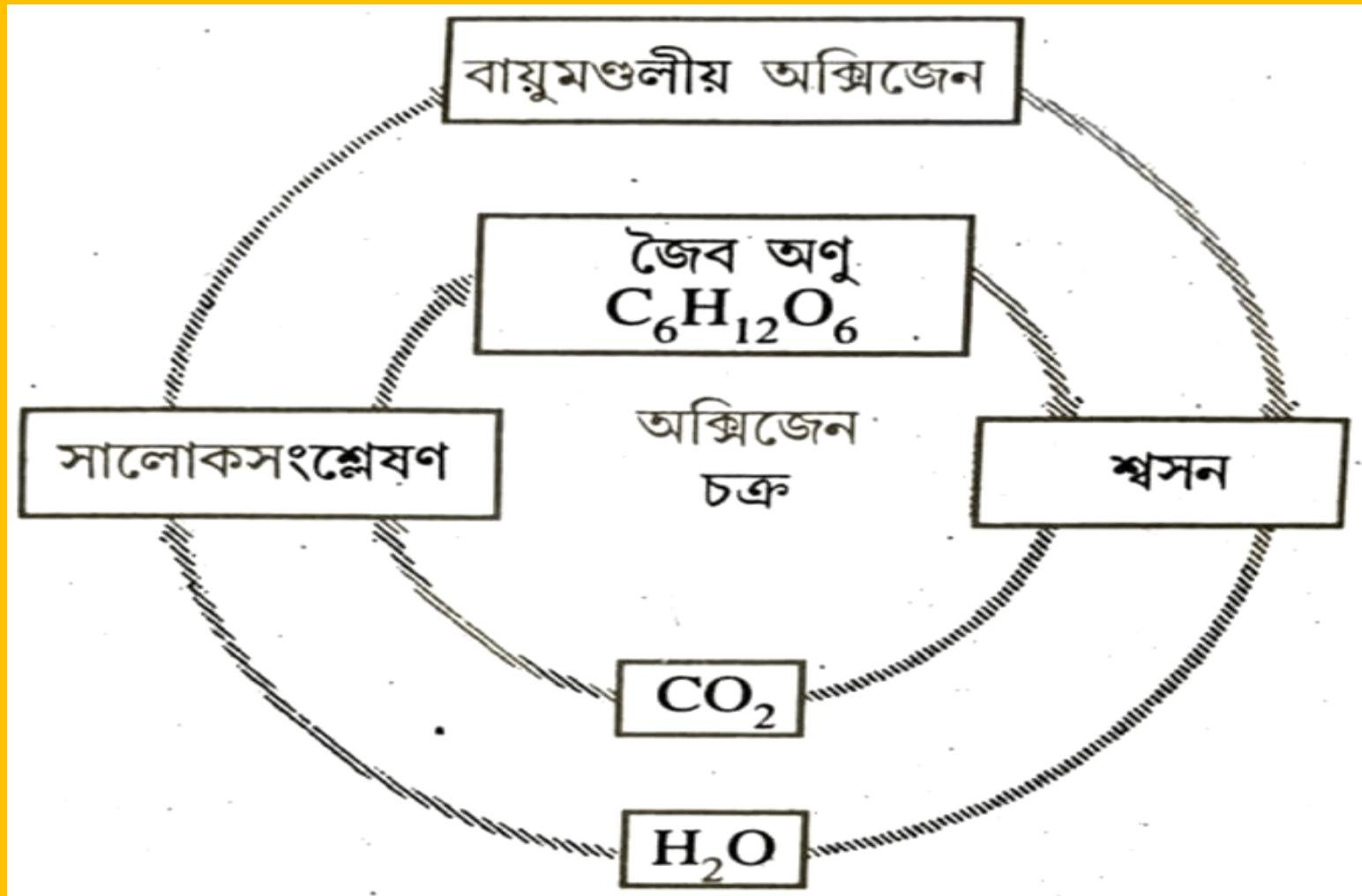

চিত্র ঃ প্রকৃতিতে অক্সিজেন চক্র

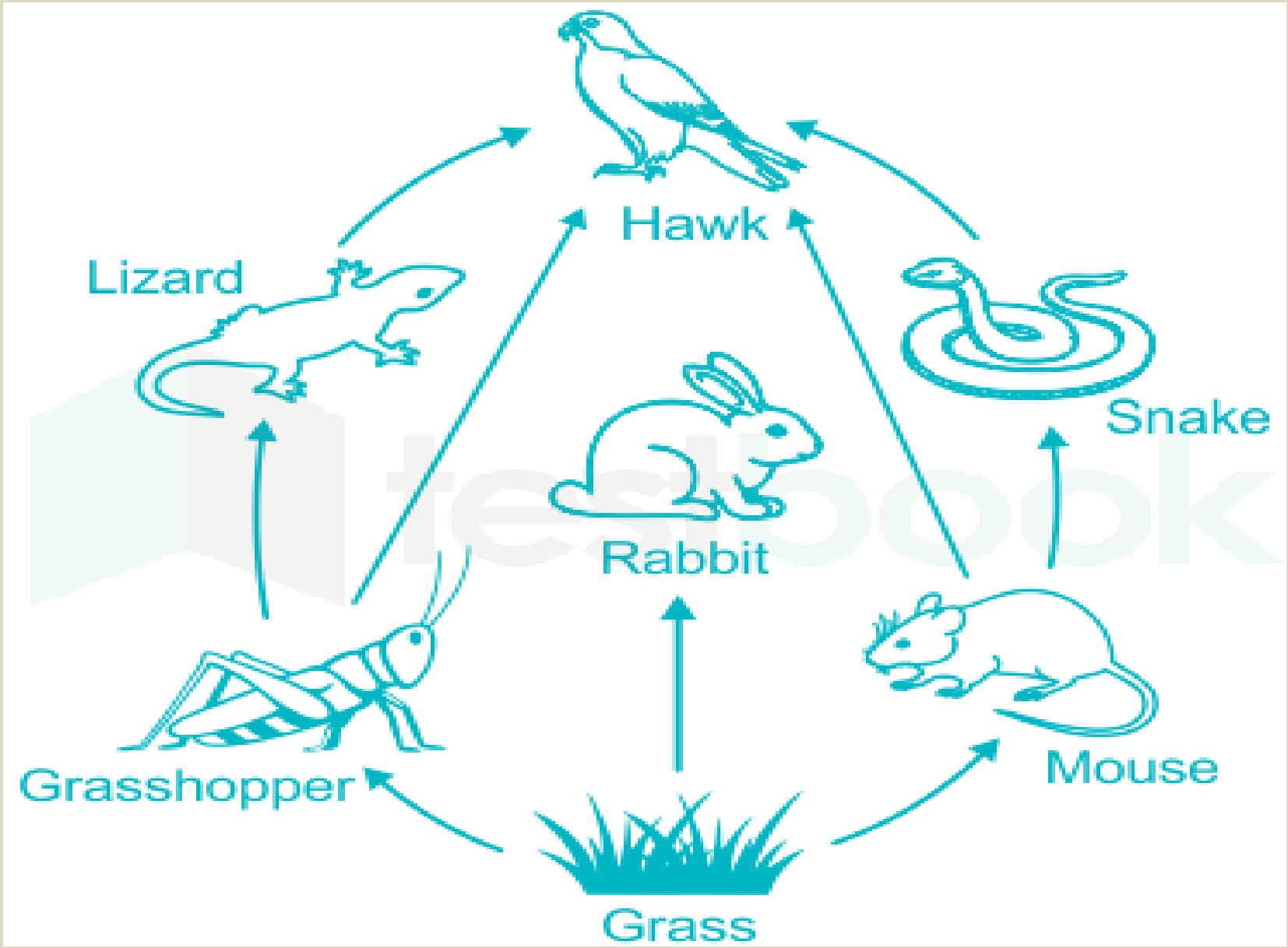

চিত্র: খাদ্যজাল

অধ্যায় -৩

বৈশিক ও জাতীয় পরিবেশগত সমস্যা

চিত্র: ৩.১ বৈশিক পরিবেশগত সমস্যা

৩.১ গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং ওজোন স্তর ধ্বংসকারী বস্তুর সংজ্ঞা

(Definition of greenhouse effect, global warming & ozone depleting substances-ODS) :

(ক) গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া (Greenhouse effect): পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে (ট্রপোস্ফিয়ারে) যে সিএফসি (CFC), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2),
জলীয় বাষ্প এবং ওজোন স্তর আছে তা গ্রিনহাউজের কাচের ঘরের মতো কাজ করে। ফলে এই বায়ুস্তরের মধ্য দিয়ে যখন সূর্যালোক পৃথিবীপৃষ্ঠে আপতিত হয় তখন বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি ও তাপশক্তি আপতিত হয়। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ঐসব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি ও তাপশক্তি (অবলোহিত রশ্মি)-কে মহাশূন্যে বিকিরিত হতে দেয় না (চিত্র ৩.২), যার ফলশ্রুতিতে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সংঘটনের ট্রিগারিং ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে। এ ঘটনাবলিকে গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া বা গ্রিনহাউজ ইফেক্ট বলে।

গ্রিনহাউজ প্রভাব

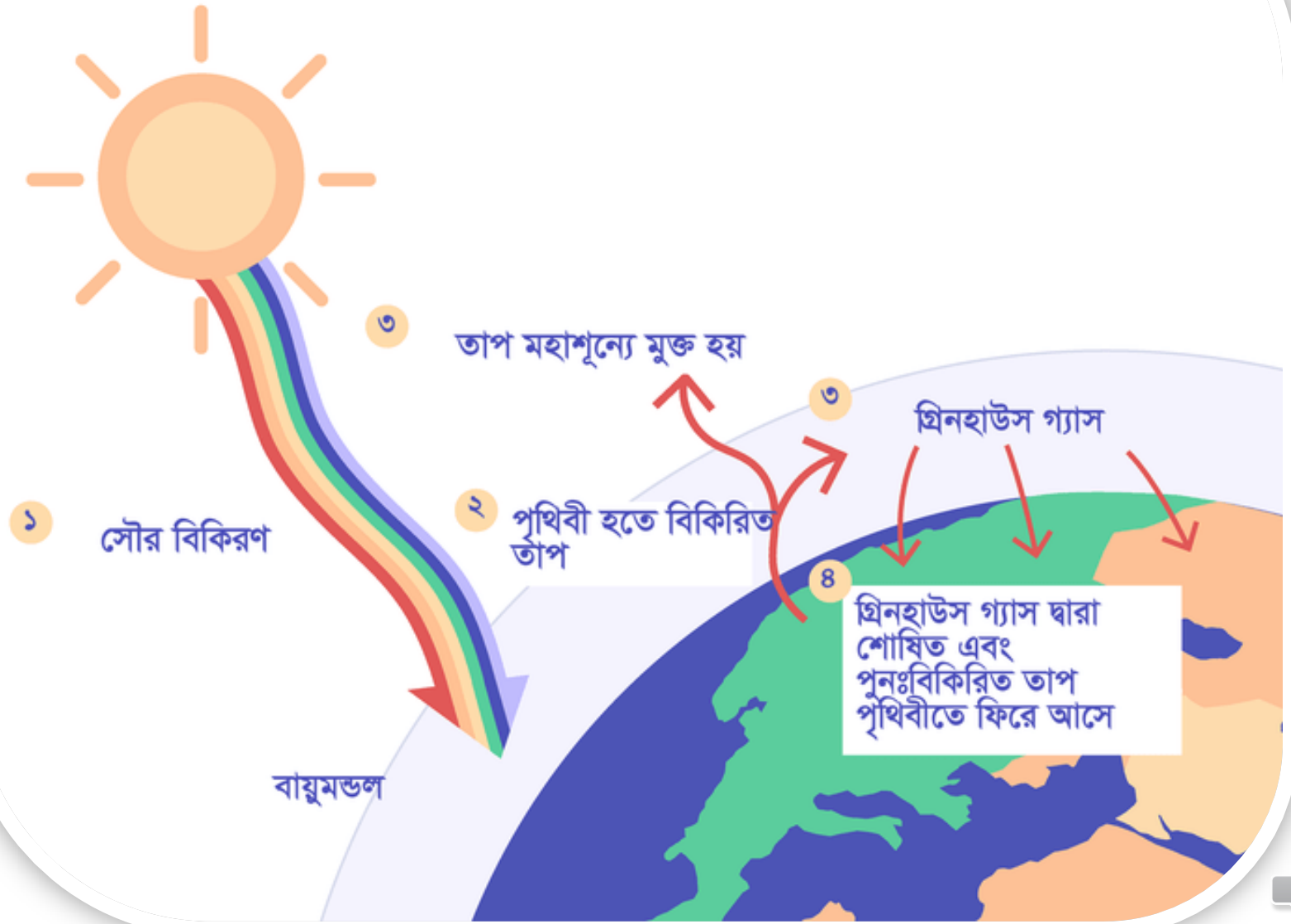
১
সৌর বিকিরণ
২
পৃথিবী হতে বিকিরিত তাপ
৩
তাপ মহাশূন্যে মুক্ত হয়
৩
গ্রিনহাউস গ্যাস
৪
গ্রিনহাউস গ্যাস দ্বারা শোষিত এবং পুনঃবিকিরিত তাপ পৃথিবীতে ফিরে আসে
বায়ুমন্ডল

অ্যাসিড বৃষ্টি

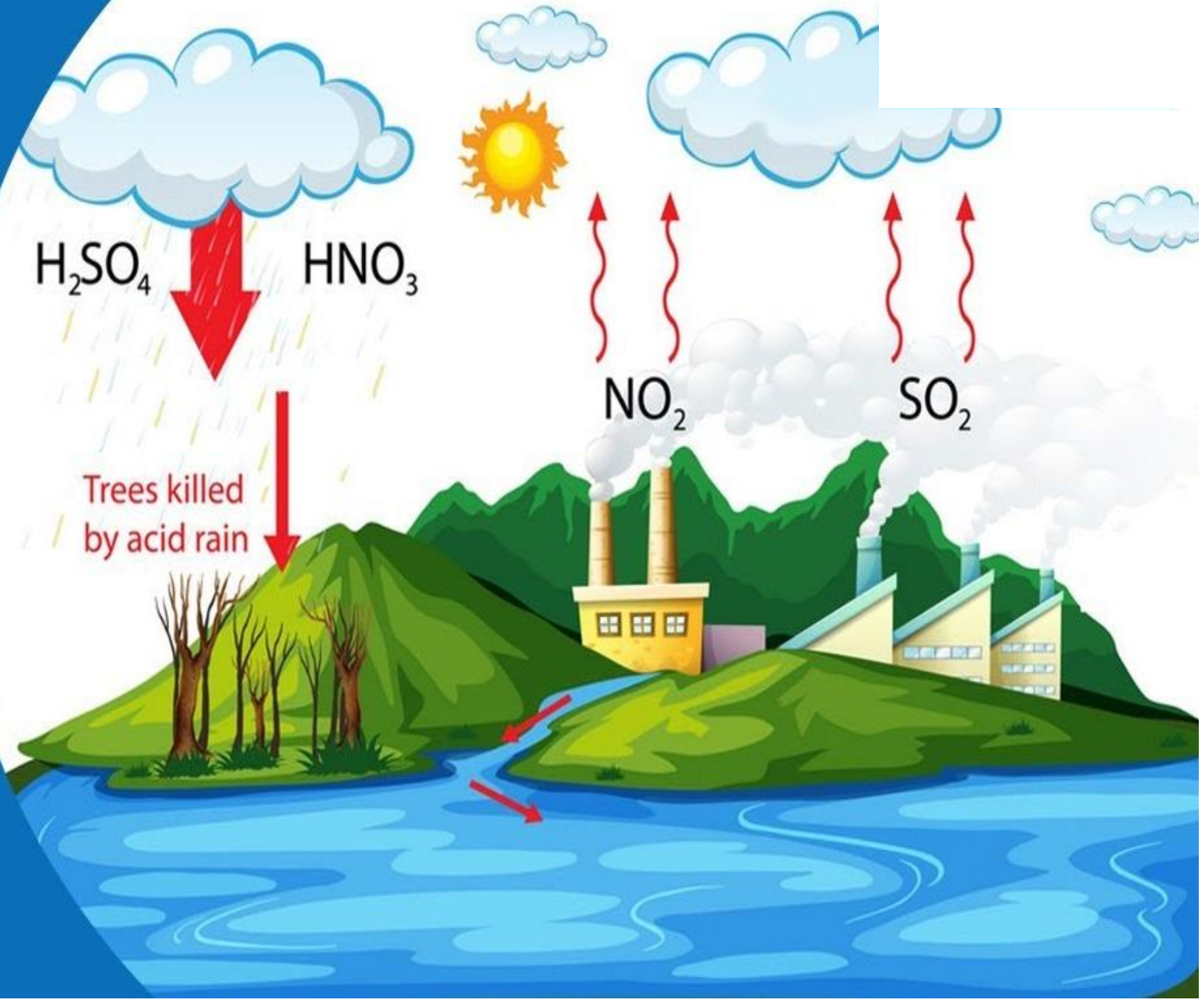

অধ্যায় -৪

পানি ও বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনা

৪.৩ পানীয় জল এবং বর্জ্যপানির আদর্শ মান (Quality standards of drinking water and wastewater) 3 আজকাল আমরা বেশিরভাগই প্রাকৃতিক পানি সরাসরি পানীয়ের জন্য ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করি। কারণ বিভিন্ন উৎস থেকে জৈবিক (Biological), ভৌত বা রাসায়নিক (Physical or Chemical) অপদ্রব্যগুলো ভূপৃষ্ঠের পানি বা ভূগর্ভস্থ পানির সাথে মিশ্রিত হয়। (ক) পানীয় জলের আদর্শ মান (Quality standards of drinking water) 1 পানের জন্য উপযুক্ত বা যোগ্য পানিকে পানীয় জল বা ড্রিংক্যাবল ওয়াটার বা পোর্টেবল ওয়াটার বলা হয়।

এটি স্বাচ্ছ (Transparent) হওয়া উচিত।

পানীয় জলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যঃ পানীয় জলের মধ্যে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা অত্যাবশক পানীয় জল বর্ণহীন এবং গন্ধহীন হওয়া উচিত।

এটি বিভিন্ন ধরনের অপদ্রব্য বা অশুদ্ধতা যেমন- সাসপেন্ডেড সলিড (থিতানো কঠিন কণা) থেকে মুক্ত থাকা উচিত। এটির মধ্যে আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু খনিজ ও লবণ (Minerals and salts) এবং স্বাদের জন্য কিছু দ্রবীভূত গ্যাস থাকা উচিত।

এটি ক্ষতিকারক অণুজীব যেমন- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।

খাবার পানিঃ ১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক হেলথ সার্ভিস (USPIIS) সর্বপ্রথম খাবার পানির জন্য কয়েকটি গুণগত মান আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে USPHS এ আদর্শ মান ১৯২৫, ১৯৪২, ১৯৪৬ ও ১৯৬২ সালে সংশোধন করে। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে এই মানের কঠোর অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন এজেন্সি (USEPA) দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। এ সংস্থাটি অর্থাৎ USEPA একটি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব লক্ষ করে সময় সময় পানির আদর্শ মান পরিবর্তন ও তা প্রকাশ করে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সর্বপ্রথম ১৯৫৮ সালে খাবার পানির আদর্শ মানমাত্রা (Quality standard) প্রকাশ করে। পরবর্তীতে উক্ত মানমাত্রা ১৯৬৩, ১৯৬৮ এবং ১৯৭১ সালে কয়েকবার সংশোধন করা হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৭০ সালে সর্বশেষ সংশোধিত ইউরোপীয় আদর্শ মানমাত্রা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এ সংস্থা আদর্শ মান প্রণয়নের পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী খাবার পানির জন্য সার্বজনীন একটি গুণগত নির্দেশিকা (Guideline for drinking water quality) তৈরি করে। এ নির্দেশিকায় আরও বহুসংখ্যক প্যারামিটার অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিভিন্ন দেশকে তাদের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান ও পানির প্রাপ্যতা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে পৃথক পৃথক জাতীয় পানির আদর্শ মানমাত্রা প্রণয়নে উৎসাহিত করা হয়। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও বিশ্বস্বাস্থ্য এ সংস্থার নির্দেশিকার (১৯৭১) আলোকে ১৯৭৬ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় পানির আদর্শ মানমাত্রা প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে সংস্থার খাবার পানির গুণগত মানের নির্দেশিকার আলোকে বিএসটিআই (Bangladesh Standard and Testing Institution-BSTI) ১৯৮৯ সালে উক্ত আদর্শ মানমাত্রাটি সংশোধন করে (BDS 1240.1989)। সর্বশেষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় 'পরিবেশ সংরক্ষণ অ্যাক্ট, ১৯৯৫' এর আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর (Department of Environment-DoE) খাবার পানির জন্যে একটি সার্বিক আদর্শ মানমাত্রা প্রণীত করে ১৯৯৭ সালে গেজেট প্রকাশ করে।

অধ্যায় -৫

বায়ুদূষণ,এনার্জি,এবং কার্বন ফুটপ্রিন্ট

চিত্রঃ৫.১ বায়ুদূষণ

৫.১ এনার্জি বা শক্তির উৎস, উৎপাদন এবং ব্যবহার (Sources, production and consumption of energy) 8

(ক) এনার্জি বা শক্তির উৎস (Sources of energy) : বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা শক্তি পাই। এই শক্তি কখনো আসছে কয়লা, তেল বা
খাবার থেকে; আবার কখনো আসছে বায়ুপ্রবাহ বা পানির স্রোত থেকে। এসব উৎস থেকেই আমরা তাপ, আলো, বিদ্যুৎশক্তি পাই। যে শক্তি বারবার ব্যবহার করা যায় এবং ব্যবহারের পর নিঃশেষ হয়ে যায় না অর্থাৎ একবার ব্যবহারের পর যে শক্তি পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ থাকে, তাকে নবায়নযোগ্য শক্তি বলে। নবায়নযোগ্য শক্তির অপর নাম 'ক্লিন এনার্জি' বা গ্রিন এনার্জি। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি হতে নবায়নযোগ্য শক্তি পাওয়া যায়। আর যেগুলো পুনরায় বা বারবার ব্যবহার করা যায় না, সেগুলোই অনবায়নযোগ্য শক্তি। কয়লা, তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি হতে অনবায়নযোগ্য শক্তি পাওয়া যায়।
সূর্যই প্রায় সকল শক্তির উৎস। এ ছাড়াও পরমাণুর অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসের নিউক্লীয় শক্তি ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত গলিত উত্তপ্ত পদার্থ থেকে প্রাপ্ত শক্তিও শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পৃথিবীতে যত শক্তি আছে তার প্রায় সবটাই কোনো না কোনোভাবে সূর্য থেকে আসা বা সূর্যকিরণ ব্যবহৃত হয়েই তৈরি হয়েছে।
(খ) শক্তি উৎপাদন (Production of energy): শক্তি উৎপাদন বলতে শক্তির রূপান্তরকেই বুঝায়। শক্তি এক রূপ থেকে শুধুমাত্র অন্যরূপে রূপান্তরিত হতে পারে। এর কোনো সৃষ্টি বা ক্ষয় নেই। রূপান্তরের আগে এবং পরে মোট শক্তির পরিমাণ একই থাকে। ফলে বিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তনীয়।
অতএব "শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি কেবল একরূপ হতে অন্য এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। রূপান্তরের আগে ও পরে মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।" এটাই শক্তির নিত্যতার সূত্র।

প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার শক্তি রয়েছে। এ সকল শক্তি একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং এক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। একেই শক্তির রূপান্তর বলে। নিচে শক্তির রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো-

১। বিদ্যুৎশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তিঃ বিদ্যুৎশক্তি চালনা করে পাখা ঘুরানো হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

২। রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপশক্তি: কয়লা পোড়ালে তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এ তাপ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৩। বিদ্যুৎশক্তি থেকে শব্দশক্তি: বিদ্যুতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজানো হয়। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজার ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৪। বিদ্যুৎশক্তি থেকে তাপ ও আলোকশক্তিঃ বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে সেটি ফিলামেন্টে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় ওউত্তপ্ত হয় এবং আমরা আলো দেখতে পাই। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তি তাপে এবং তাপশক্তি আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৫। বিদ্যুৎশক্তি থেকে চুম্বকশক্তি: কাচা লোহার উপর অন্তরিত (Insulted) তামার তার জড়িয়ে বিদ্যুৎ চালনা করলে লোহাটি চুম্বকে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তি চুম্বকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৬। তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তিঃ কয়লা পুড়িয়ে তাপ উৎপন্ন করা হয়। এ তাপের সাহায্যে পানিকে বাষ্পে পরিণত করা হয়, যা দ্বারা টারবাইন চালানো হয়। আবার টারবাইন চালিয়ে ডায়নামো থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে তাপশক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৭। আলোকশক্তি থেকে রাসায়নিক শক্তি: ফটোগ্রাফিক ফিল্মের উপর আলো ফেললে রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে আলোকচিত্র তৈরি হয়।এক্ষেত্রে আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৮। যান্ত্রিক শক্তি থেকে পারমাণবিক শক্তি: ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে ভেঙে যায় এবং প্রচুর পরিমাণ পারমাণবিক শক্তি

৫.২.১ প্রধান বায়ুদূষক গ্যাস (Principal air polluting gases) :
প্রধান বায়ুদূষণকারী গ্যাস এবং তাদের উৎস উল্লেখ করা হলো-
ক) কার্বন মনোক্সাইড (CO): বর্ণহীন, গন্ধহীন অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস। কার্বনসমৃদ্ধ যৌগের (যথা- জীবাশ্ম জ্বালানি) অসম্পূর্ণ দহনে কাল মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।
প্রধান উৎস:
(i) অটোমোবাইল এগজস্টস
(ii) ইলেকট্রিক এবং ব্লাস্ট ফার্নেস
(iii) পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি
(iv) কোল মাইন এবং গ্যাস ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট।

CARBON
FOOTPRINT

অধ্যায় -৬

শব্দদূষণ

শব্দদূষণ

আমি অপ্রয়োজনে
হর্ণ
বাজাই না।
আপনিও
বাজাবেন না।

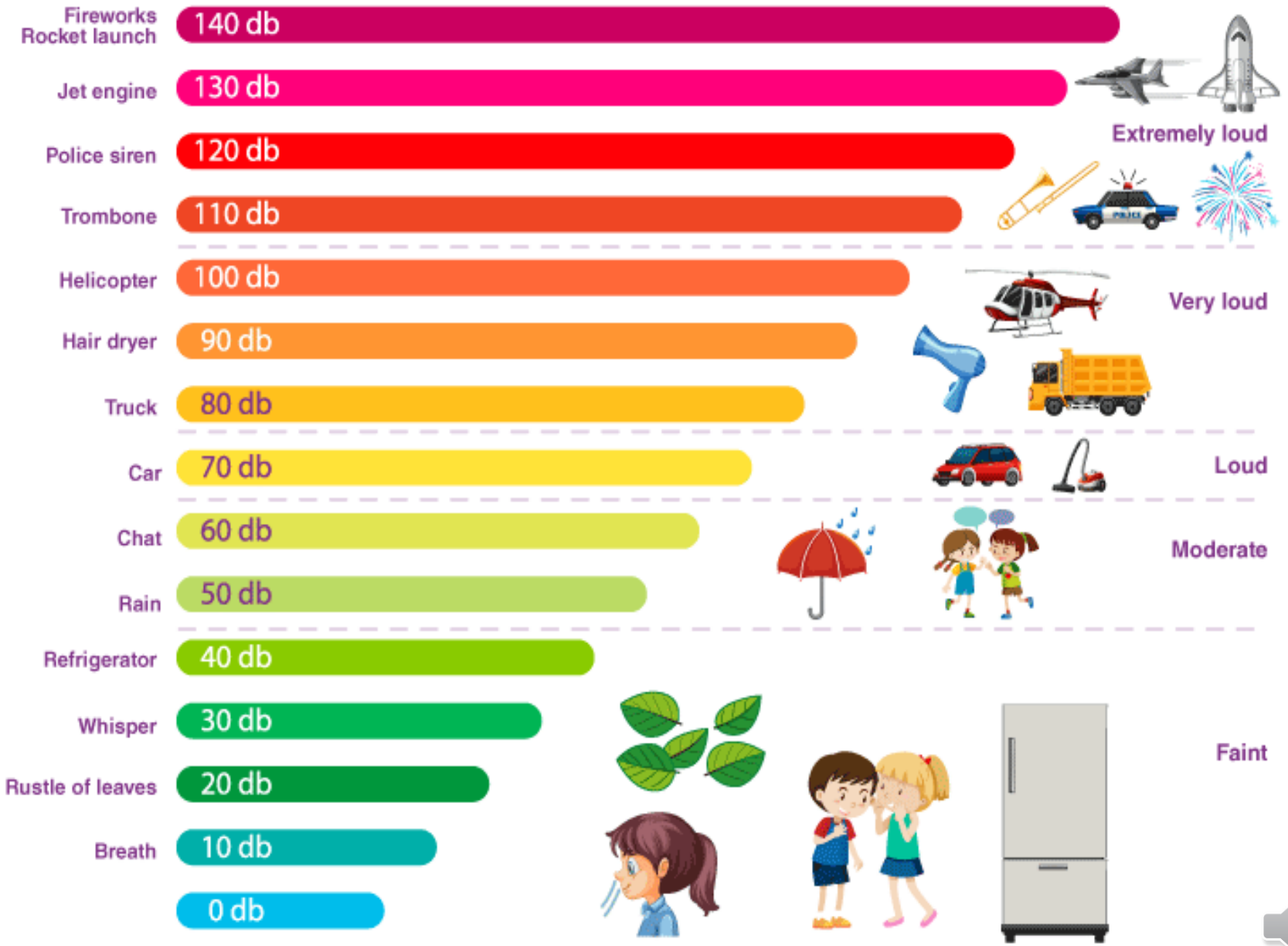

BYJU'S
The Learning App
Fireworks
Rocket launch
140 db
Jet engine
130 db
Police siren
120 db
Trombone
110 db
Extremely loud
Helicopter
100 db
Hair dryer
90 db
Truck
80 db
Very loud
Car
70 db
Loud
Chat
60 db
Rain
50 db
Moderate
Refrigerator
40 db
Whisper
30 db
Rustle of leaves
20 db
Breath
10 db
0 db
Faint

৬.৮.১ শিল্পে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রকৌশল পদ্ধতিসমূহ (Engineering methods for industrial noise control) :

একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শব্দের (নয়েজ) তীব্রতা বা ভলিউম হ্রাস করে শব্দের তীব্রতা ক্ষয় (Noise attenuation) বা হ্রাস করা হয়। শিল্প সেক্টরে অনেক প্রকারের শব্দ (নয়েজ) হ্রাসকারী কৌশল সংযুক্ত করা যেতে পারে। নয়েজ কমানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকরী এবং যৌক্তিক উপায়সমূহের একটি হলো শুরু থেকেই এই সিস্টেমগুলো সেটআপ করা, যা নয়েজ মাত্রা কমিয়ে দেবে। এরূপ নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ-

(i) ড্যাম্পিং (Damping): চুট, হোপার, মেশিন গার্ড, কনভেয়ার, প্যানেল ইত্যাদি হলো শব্দের মাত্রা কমানোর অর্থাৎ শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি।

(ii) উপযুক্ত সরঞ্জামাদি নির্বাচন (Selecting efficient equipment): ফ্যান, কম্প্রেসর, পিডি রোয়ার এবং ইঞ্জিনগুলো এমনভাবে নির্বাচন করা যেন তা দক্ষতার সাথে কাজ করে এবং শব্দ হ্রাস করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (iii) ফ্যানের গতি সামঞ্জস্য করা (Adjusting fan speed): ফ্যানের শব্দ ফ্যানের গতির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত, তাই সাধারণ
সমন্বয়গুলো উল্লেখযোগ্য ফলাফল আনতে পারে অর্থাৎ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। (iv) উচ্চচাপের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ (Controlling high pressure steam): উচ্চ পথের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করলে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অন্যান্য ভেন্টের নয়েজ নিয়ন্ত্রিত হয়।

(v) স্ট্যাক সাইলেন্সার (Stack silencers): স্ট্যাক সাইলেন্সার দিয়ে এগজস্ট নিঃসরণের সময় আওয়াল কমিয়ে তা অষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। (vi) ধ্বনিগত চিকিৎসা (Acoustically treatment) : ফ্যান, ব্লোয়ার ও ভেন্টিলেশনের সরঞ্জামাদি ধ্বনিগত ট্রিটমেন্ট করানোর মাধ্যমে করা যায়।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ (vii) এনক্লোজার বা বেষ্টনী ও প্রতিবন্ধক ওয়াল (Enclosures and barrier) : শিল্পে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বেষ্টনী ও প্রতিবন্ধক ওয়াল খোলা ও বন্ধ রাখা একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি।

সমাপ্ত

সবাইকে
ধন্যবাদ